ভিন্নমতের নান্দনিকতা

ড. সালমান আল আওদাহ

অনুবাদ : জোবায়ের আব্দুল্লাহ

গার্ডিয়ান

পা ব লি কে শ ন স

সূচিপত্র

উম্মাতুন ওয়াহিদা : এক জাতি	**১৩**
প্রকৃত উম্মাহর ব্যাখ্যা	১৭
বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ঐক্য	১৯
উম্মাহর বৈশিষ্ট্য	২৩
মুসলিমদের প্রতি তার ভাইয়ের অধিকার	২৫
উম্মাহর বিভক্তির শ্রেণিবিভাগ	২৮
কীসের ওপর নির্ভর করে আমাদের মতভেদগুলো তৈরি হয়	৩৭
মতবিরোধের সুন্নত	**৩৮**
মতবিরোধ একটি স্থায়ী বিষয়	৩৮
মতভেদ অপসারণ করার কি কোনো পন্থা আছে	৪৩
বিভেদের সমন্বয় সাধন	৪৭
মতভেদ ও তা থেকে বেঁচে থাকা	৫২
মতভেদ ও ভ্রাতৃত্ব	৫৩
বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালা	৫৫
উদ্দেশ্য ও মূল ভাষ্যের মধ্যে পার্থক্য	৫৬
কে ভুল ও সঠিক	৫৯
প্রথম যুগের কিছু মতবিরোধের নমুনা	৬৩
আলিমদের মধ্যে ইখতেলাফের কারণ	**৬৯**
অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা	৮১
জনসাধারণ ও আলিমের মাঝে পার্থক্য	৮৮
তাকওয়া অবলম্বন করার কয়েকটি কৌশল	৯২

মতভেদের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার	**৯৮**
কথোপকথনকেন্দ্রিক সমস্যা	৯৯
ইখতেলাফের অধিকার	১০৮
মতভেদ ও ইখতেলাফের নীতিমালা	১১৫
মতভেদের ব্যবস্থাপনা	১৩৪
বিচ্ছেদের হাদিস	১৪১
ভালো ইখতেলাফ, মন্দ ইখতেলাফ	**১৪৮**
বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্যের মধ্যে পার্থক্য	১৪৮
বৈচিত্র্যের ও বৈপরীত্যের ইখতেলাফ	১৪৯
এই সব ইখতেলাফ কি অনন্ত বিদ্যমান	১৫৯
হৃদয়ের ঐক্য প্রয়োজন, মস্তিষ্কের ঐক্য নয়	**১৬১**
সামগ্রিক ঐক্যের পেছনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ	১৬৪
সামগ্রিক দ্বীন	১৬৮
ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূলনীতি	১৭৩
ইখতেলাফ ও মতভেদকে গ্রহণ করা ছাড়া ঐক্য অসম্ভব	১৭৫
শেষ কথা	**১৮৭**
গ্রন্থপঞ্জি	**১৮৮**

মতবিরোধের সুন্নত

মতবিরোধ একটি স্থায়ী বিষয়

মতবিরোধকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবনের স্বভাবগত অংশ হিসেবে বানিয়েছেন। বাবা ও সন্তানের মাঝে মতবিরোধ থাকে; অথচ সন্তান তার বাবারই অংশ বা শাখা। সন্তান ও বাবার মাঝে কত রকমের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় : চিন্তাগত, স্বভাবগত, আকৃতিগত ও বর্ণগত ইত্যাদি আরও কত পার্থক্য। তবে এত সব পার্থক্য ও ভিন্নতার পরেও নতুন শিশুর আগমন বাবার সম্পদের উত্তরাধিকারের আইনে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। উত্তরাধিকার আইন সর্বদা একই রকম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ-

‘তাঁর মহিমার নিদর্শন হচ্ছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।’ সূরা রূম : ২২

মানুষের বর্ণ-বৈচিত্র্য একটি প্রকাশ্য ব্যাপার। এটি আল্লাহর একটি বিরাট নিদর্শন, তাঁর প্রজ্ঞাও আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। আর ভাষার বৈচিত্র্যের ব্যাপার হলো–একটি অন্তর্নিহিত ও অপ্রকাশিত ব্যাপার। এর মাঝে রয়েছে শব্দের বৈচিত্র্য, শব্দগুলো উচ্চারণের সময় স্বরের বৈচিত্র্য।

কোনো কোনো সাহিত্যিক সুন্দর সুন্দর শব্দের অবতারণা করেন। আবার কেউ কেউ গালিগালাজ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা ছাড়া লিখতেই পারে না। আশাবাদী লেখকরা আশার কথা লিখেন, হতাশাবাদী লেখক সব সময় অনিষ্টের ভয় করেন। তাদের মধ্যে যে ভাষাগত পার্থক্য রয়েছে, এটিই হলো ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য।

সূরা রূমের উপরিউক্ত আয়াতটির ভাষ্য বেশ কিছু আলোচনার দিকে ইঙ্গিত করে। যেমন–

- মানুষের শ্রেণিবিন্যাসগত বৈচিত্র্যের দিকে
- রোম-পারস্যের মাঝে ঐতিহাসিক হিংস্র দ্বন্দ্বের দিকে এবং
- ইসলাম-বিজয়ের পূর্বপ্রস্তুতি কেমন পরিস্থিতি ছিল, তার বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

যেমন : এই সূরার ৪ ও ৫ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ- بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ-

‘একদিন আল্লাহর দেওয়া বিজয়ে মুমিনরা আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।’ সূরা রূম : ৪-৫

আয়াতের ভাষ্য বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মাঝে পারস্পরিক শক্তির আদান-প্রদানের দিকে ইঙ্গিত করে।

যেমন : এই সূরার ৯ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْآ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

‘তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন ছিল? শক্তিতে তারা ছিল তাদের থেকেও প্রবল। তারা জমি চাষ করত এবং আবাদ করত। তারা জমি আবাদ করত তাদের থেকেও বেশি। সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট এসেছিল। মূলত তাদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।’ সূরা রূম : ৯

অথবা আয়াতটি দ্বারা কিয়ামতের দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে ছোটাছুটি করবে, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ-

‘যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।’ সূরা রূম : ১৪

সূরা রূমের প্রত্যেকটা একত্ববাদী আলোচনাতেই এই সৃষ্টিশীল জগতের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের ব্যাপারকে সাদরে গ্রহণ করার আলোচনা উঠে এসেছে। যেমন : সূরা রূমেরই ১৭-১৮ আয়াতে বলা হচ্ছে–

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ- وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ-

‘সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সকাল ও সন্ধ্যায়। আর অপরাহ্ন ও জোহরের সময়। আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য সাব্যস্ত।’ সূরা রূম : ১৭-১৮

এই আয়াতের প্রথম অংশে সকাল-সন্ধ্যা, অপরাহ্ন, জোহর ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে কালের বৈচিত্র্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর পরের অংশে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী শব্দ দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে স্থানের ভিন্নতার দিকে। পরের আয়াতগুলো দিয়ে ইহকাল-পরকাল বা জীবন-মৃত্যুবিষয়ক বৈচিত্র্যতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ-

‘তিনি জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন, জমিনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করে তোলেন, আর এভাবেই তোমাদেরও পুনরুত্থান করা হবে।’ সূরা রূম : ১৯

এর পরের আয়াতে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি ও তার বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ-

‘এটাও তাঁর নিদর্শনের ভেতর অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে; অতঃপর তোমরা এখন মানুষ হয়ে ছড়িয়ে আছ।’ সূরা রূম : ২০

সভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সাম্যের মূলভিত্তি পূর্ণতা পেয়েছে তিনটি উপাদানের মাধ্যমে—স্থান, কাল ও মানুষ।

মানুষ যেমন স্বভাবতই বিভিন্ন রকমের, তেমন আসমান-জমিনের সৃষ্টিতেও রয়েছে ভিন্নতা; তবে একটি অপরটির সম্পূরক। আসমান ও জমিনের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার সাথে নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে তুলনা করা যায়। কারণ, এই দুইয়েরই রয়েছে গতিময়তা ও স্থিতিশীলতায় বৈচিত্র্য এবং দায়িত্বে, কর্তব্যে ও পরিপূর্ণতায় ভিন্নতা।

বর্ণ ও ভাষাগত বৈচিত্র্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। প্রশংসার যোগ্য সেই সব জ্ঞানী ব্যক্তিরা, যারা সৃষ্টির বৈচিত্র্যতার রহস্য জানেন। গবেষণার মাধ্যমে প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার একত্ববাদ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার বিষয়কে বের করে আনতে পারেন।

দিন-রাত, উর্বরতা-অনুর্বরতা, দুনিয়া-আখিরাত—এগুলো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিপরীত। আবার একই সঙ্গে একটি অপরটির পরিপূরক। এই সব বৈচিত্র্যের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি ও দ্বীনের খুঁটিটিকে মজবুত করা হয়েছে। প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেওয়া কিংবা কৃত্রিম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। যেমন : কুরআনে এসেছে—

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ-

‘বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো। সালাত কায়েম করো, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দ্বীন নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, আর প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।’ সূরা রূম : ৩১-৩২

মূলত এই মহিমান্বিত সূরাটি নাজিল হয়েছে বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে। এতে বৈচিত্র্য প্রমাণে বিভিন্ন প্রকার দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের বিভিন্ন পর্যায়। যেমন : মানুষের দুর্বলতার শুরুর পর্যায়, শক্তিমত্তার পর্যায়, দুর্বলতার শেষ পর্যায় অর্থাৎ, বার্ধক্য নিয়ে এতে আলোচনা হয়েছে।

ইখতেলাফ একটি ঐশ্বরিক রীতি, যতক্ষণ না মানুষ তা নিজেদের হাতে সংকুচিত করে ফেলে। তবুও মানুষ অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে—কবে এই সব ইখতেলাফের অবসান ঘটবে? আর আমরা সকলে কবে ঐকমত্যে পৌঁছাব?

উত্তর হলো—মানুষের মাঝের এই ইখতেলাফ ও বৈচিত্র্য ততদিন থাকবে, যতদিন আল্লাহ মানুষকে এর উত্তরাধিকার বানাতে থাকবেন। সুতরাং সমস্ত মানুষ ঐকমত্যে পৌঁছাবে—এমন স্বপ্ন দেখার কোনো সুযোগ নেই। বিবাদের এই পরিক্রমা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্যের সাথেই জড়িত। ভেবে দেখুন, প্রত্যেকটা জিনিস যখন একই রকমের হয়, তখন সেগুলো কতটা বিরক্তিকর, অনর্থক, একঘেয়েমি ঠেকে, সেটাই কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ- اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-

> ‘যদি আপনার রবের ইচ্ছা হতো, তাহলে সমস্ত মানুষকে তিনি এক উম্মত বানাতে পারতেন; কিন্তু তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এমনভাবে যে, তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যার ওপর আপনার রবের রহমত আছে (সে ছাড়া)। আর এজন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর এর ফলে আপনার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানুষের সকালের দ্বারাই জাহান্নাম পূর্ণ করব।’ সূরা হুদ : ১১৮-১১৯

সুতরাং মতানৈক্য হলো একটি ভাগ্যকেন্দ্রিক বাস্তবতা, যা মানুষের স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত। এর বিভিন্নতা নির্ভর করে মানুষের বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য, আকৃতি, বর্ণ, ভাষা ও দৃষ্টিকোণের ওপর। মানব মনের প্রকৃতিই হলো— একাধিক বেছে নেওয়ার যোগ্যতা থাকা। সে যাতে সৎ-অসৎ, শোকর-কুফরের যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে। পছন্দের ভিত্তিতে নিজের পথ ও পন্থাকে নির্বাচন করতে পারে। তাই তো মানুষের মাঝে রয়েছে ভালো-খারাপ, ন্যায়পরায়ণ-পাপী, মুমিন-কাফির, শক্তিশালী ও দুর্বল, জ্ঞানী ও মুর্খ, আমানতদার ও খেয়ানতকারী, সদয়-নির্দয়, অনুসরণকারী ও অনুসরণীয়, ন্যায়বিচারক ও জালিম, ভুলকারী-সঠিককারী ইত্যাদি ধরনের লোক। যদিও এই গুণগুলোর কিছু শরিয়াহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, আবার কিছু নিন্দনীয়।

আলিমদের মধ্যে ইখতেলাফের কারণ

শরিয়াহ ও সামগ্রিক ধর্মীয় বিষয়ে আলিমগণ হলেন উম্মাহর নেতৃস্থানীয়। অন্যদের মতো তাঁরাও মতবিরোধ করেন। তবে বেশ কিছু কারণে আলিমগণ তুলনামূলক বেশি মতবিরোধ করে থাকেন। তাঁদের মাঝে অধিক মতবিরোধের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাব ও চিঠিপত্রে অনেক আলিম-গবেষক আলোচনা করেছেন। যেমন : ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর লেখা—

رفع الملام عن الائمة الأعلام-

ইবনে সাইয়্যেদ আল বাতলুসি (রহ.)-এর লেখা—

التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف-

আহমদ শাহ দেহলভি (রহ.)-এর লেখা—

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف-

এ ছাড়াও ইখতেলাফ বিষয়ে আরও বহু গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা আছে।

আলিমদের মধ্যে ইখতেলাফের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ নিচে আলোচনা করা হলো।

দলিল না থাকা

কুরআনে যা কিছু দুর্বোধ্য ও সংক্ষিপ্ত বিষয় আছে, তার ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদাতা হলো রাসূল ﷺ-এর হাদিস। সব সময় হাদিসের মূল বিবরণের ব্যাখ্যা যুগের সমস্ত আলিমের কাছে পৌঁছে না। কিছু পাওয়া যায়, কিছু আবার অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। এই সমস্যা স্বয়ং সাহাবিদের যুগেই ছিল। তাঁরা কিছু দলিল পেলেও অন্য আরও অনেক দলিল ছিল তাঁদের কাছে অনুপস্থিত। এজন্য কেউ যখন কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ-এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতেন, তখন অন্যরা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে সেই হাদিসের ওপর আমল করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, আলি (রা.) মুরতাদদের আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার কথা বলেছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) বিরোধিতা করে রাসূল ﷺ-এর একটি হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেছিলে—'আল্লাহর রাসূল বলেছেন لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَبِ اللهِ অর্থাৎ, তোমরা কাউকে আল্লাহর পদ্ধতিতে শাস্তি দিয়ো না।' এই হাদিস শুনে আলি (রা.) বলেছিলেন—'ইবনে আব্বাস ঠিকই বলেছেন—এরপর তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছিলেন।[১]

---

১ মুসনাদে আহমদ : ১৮৭১, ১৯০১ ও ২৫৫১; বুখারি : ৩০১৭ ও ৬৯২২; তিরমিজি : ১৪৫৮

এ রকম আরেকটি উদাহরণ হলো, আবু সাইদ খুদরি (রা.) বলেন—

> ‘আমরা একবার মদিনায় আনসার সাহাবিদের একটি মজলিশে বসে ছিলাম। হঠাৎ আবু মুসা আতঙ্কিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এলো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম—‘আপনার কী হয়েছে? তিনি বললেন— উমর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর দরজায় তিনবার সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি কোনো উত্তরই দিলেন না। যখন ফিরে আসতে উদ্যত হলাম, তিনি আমাকে বললেন—তুমি কেন আমার দরজা দিয়ে ঢুকলে না? বললাম, আমি তো আপনার দরজায় গিয়ে তিনবার করে সালাম দিয়েছি, কিন্তু কেউ উত্তর দিলো না, তাই ফিরে এসেছি। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন—
>
> إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ-
>
> “‘তোমাদের কেউ যখন কারও সামনে যাওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি চেয়েও অনুমিত না পায়, তাহলে সে যেন ফিরে যায়।” আমার মুখে এই হাদিস শুনে উমর (রা.) বললেন—“এর সপক্ষে দলিল দাও, নইলে তোমার খবর আছে!’

এই ঘটনা বর্ণনা করে আবু মুসা মজলিশের সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে—যে নবি ﷺ থেকে এ হাদিসটি শুনেছে?’ তখন উবাই ইবনে কাব বললেন—‘এর পক্ষে দলিল দিতে দলের সবচেয়ে ছোটো মানুষটিই যাবে।’ এরপর আবু সাইদ বলে উঠলেন—‘আমিই সবচেয়ে ছোটো। তোমার সাথে আমি উমরের কাছে গিয়ে এর সপক্ষে প্রমাণ দেবো। আবু সাইদ বলেন—‘পরে আমি তাঁর সাথে উমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে এই হাদিসটির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলাম।’[২]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাহাবিদের একটি বড়ো দল এই হাদিসটি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। অথচ এই যুগে দলিল-প্রমাণের আনুপাতিক অনুপস্থিতির কারণে আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন হতে পারে?

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। উমর (রা.)-এর নেতৃত্বে সাহাবিরা যখন সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন তাঁদের কাছে তথ্য এলো— সিরিয়ায় প্লেগ ছড়িয়েছে। তাঁরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন, সিরিয়ায় প্রবেশ করবে কি না। উমর (রা.) প্রথমে মুহাজির সাহাবিদের সাথে এই ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তাঁরা একমত হতে পারলেন না। কেউ বললেন ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেউ বললেন সাহাবিদের এই মহামারিতে আক্রান্ত এলাকায় ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে না। এরপর তিনি আনসার সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরাও মুহাজির সাহাবিদের মতোই একমত হতে পারলেন না।

এরপর তিনি মক্কা বিজয়ের সময়ে উপস্থিত সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা একমত হয়ে পরামর্শ দিলেন, সিরিয়ায় প্রবেশ না করাই উচিত হবে। এই পরামর্শের দিকে যখন উমর (রা.)-

---

[২] বুখারি : ২০৬২, ৬২৪৫; মুসলিম : ২১৫৩, ২১৫৪

এর মন ঝুঁকে গেল, তখন আবু উবায়দা (রা.) বললেন—'হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির থেকে পালানোর জন্য ফিরে যাচ্ছেন?' তখন উমর (রা.) উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর এক তাকদির থেকে ফিরে তাঁর আরেক তাকদিরের দিকে যাচ্ছি।'

এমন সময়ে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এলেন। বিশেষ একটি কারণে তিনি এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন। এসে বললেন—'আমার কাছে এই বিষয়ে একটি হাদিস আছে। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"তোমরা যখন কোনো এলাকায় প্লেগের বিস্তারের কথা শোনো, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। যদি এমন কোনো এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে—যেখানে তোমরা ইতোমধ্যে অবস্থান করছ, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।" আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর মতামতের ওপরই তখন সাহাবিদের ঐকমত্য তৈরি হলো।'[৩]

এভাবেই আলিমদের কাছে দলিল না পৌঁছানোর ব্যাপারটি আলিমদের মাঝে ইখতেলাফ সৃষ্টি করে।

উপরিউক্ত ঘটনা ও সাহাবিদের বক্তব্য থেকে আমরা যে ফিকহি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি তা হলো—

১. সর্বজনীন বিষয়গুলো গভীর চিন্তা-ভাবনা, দৃঢ় সংকল্প ও পর্যালোচনার সাহায্যে গ্রহণ করতে হয়।

২. আকস্মিক বিপদে বিদগ্ধজনের মতবিরোধকে মেনে নিতে হয়।

কেননা, শেষোক্ত উদাহরণে দেখতে পাই—উমর (রা.) যখন পরামর্শ চেয়েছিলেন, মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল; অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাহাবি ও পরস্পরের কাছে মর্যাদাশীল। তাঁরা কিন্তু এক বিষয়ের ইখতেলাফকে পরবর্তী কোনো ইস্যুর জন্য জিইয়ে রাখেননি। এর ফলে তাঁদের কারও জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণার পর্যায়গত মর্যাদা সংকীর্ণও হয়ে পড়েনি।

এ রকম সময়ে ধৈর্যশীল ও দাপুটে সাহাবিরা সিরিয়ায় প্রবেশের পক্ষেই ছিলেন, আর ফকিহ ও গবেষক সাহাবিরা ছিলেন ফিরে যাওয়ার পক্ষে। যেহেতু ফকিহ সাহাবিরা শরিয়াহ সম্পর্কে অধিক জানতেন, তাই ফিরে যাওয়ার পক্ষে তাঁদের কাছে দলিল ছিল। অপরদিকে অন্য সাহাবিরা ছিলেন দৃঢ়চেতা, প্রতিবাদী, ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ। ফলে তাঁরা সিরিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন।

---

[৩] বুখারি : ৫৭২৯; মুসলিম : ২২১৯

মতভেদের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার

আমরা ইখতেলাফের শিষ্টাচার ও নৈতিকতা নিয়ে কেবল অনিন্দ্যসুন্দর কথাই বলি, আর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অসাধারণ সব তত্ত্ব কপচাই। কিন্তু বাস্তবতা হলো—আমাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই এই তত্ত্বগুলো নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে এবং ব্যবহারিক আচরণ ও অন্যদের সাথে মতবিরোধের সময়ে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারে। ব্যাপারটা এমন—কেউ যখন আমাদের সাথে ইখতেলাফ করে, তখন আমরা তাদের মতবিরোধের নৈতিকতা ও শিষ্টাচার মেনে চলার উপদেশ দিই; কিন্তু নিজেদের ইখতেলাফের বেলায় এই সব শিষ্টাচার ও নৈতিকতার কথা মাথায় রাখি না।

মতভেদের শিষ্টাচার ও নৈতিকতা এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—যা প্রত্যেকটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও মসজিদে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মের প্রত্যেককেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। তারা যেন অনুশীলনের মাধ্যমে এটাকে একটি ইবাদত ও অভ্যাস বানিয়ে নিতে পারে।

মতভেদের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার রক্ষা করা একটি ইবাদত; অন্যদিকে এটি একটি চারিত্রিক স্বভাবও বটে। মতভেদের শিষ্টাচার ছিল সমস্ত নবির সুন্নাহ। তাই এটি ইবাদত। আর এটাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা কতই-না উত্তম! তখন এই সুন্নত আদায় করতে আর নফসের সাথে যুদ্ধ করতে হবে না।

কথোপকথনের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শাসকের ক্ষেত্রে তার অধীনস্থদের অধিকার রক্ষা করার লক্ষ্যে শিষ্টাচার প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। এমনকী শাসকবিরোধীদের অধিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রেও শিষ্টাচার রক্ষা করা শাসকের অপরিহার্য দায়িত্ব; যেমনটা রাসূল ﷺ করেছেন।

তিনি মুসলমানদের পাশাপাশি মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকদের অধিকার রক্ষায় ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। সুতরাং তাঁর ধৈর্য, ক্ষমা, ছাড় দেওয়া, ইনসাফ; সর্বোপরি মানুষের কাছে তাঁর হক পৌঁছে দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই।

মতভেদের শিষ্টাচারের জন্য প্রয়োজন এমন আলিমের, যিনি ছাত্রদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন, ছাত্রদেরদের প্রতি নীতিবান। যিনি ছাত্রদের সমস্যা ও আপত্তি সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করেন। ছাত্রদের কাছে তাঁর হৃদয় খুলে তাদের স্বাধীন দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। কোনো

ব্যক্তিপূজার দীক্ষা না দিয়ে বরং এমন পন্থা বাতলে দেন–যা অনুসরণে জাতির মধ্য থেকে অভিজাত শিক্ষার্থীরা বের হয়ে আসে।

মতভেদের শিষ্টাচারের জন্য প্রয়োজন এমন পিতার, যিনি তার সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল। কোনো বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে তিনি সন্তানদের প্রতি ক্ষমাশীল হন এবং বুঝতে পারেন–তারা তো মুসলিম উম্মাহর তরুণতম সদস্য, প্রবীণ সদস্য নয়। সন্তান যে বাবার মতোই হুবুহু হতে হবে, তা কিন্তু না; বরং মন ও মননে বাবার মতো হওয়া জরুরি। শারীরিক অবয়বের ক্ষেত্রে বাবার মতো কণ্ঠস্বর, দৈহিক গড়ন ইত্যাদি হওয়া তো বিশেষ কিছু না।

এই পর্যায়ে আমি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান মতভেদগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

কথোপকথনকেন্দ্রিক সমস্যা

বর্তমান যুগ উন্মুক্ত; যেখানে সীমানা ভেঙে গেছে, যেখানে বাধা উতরে গেছে। এটা হলো মহাশূন্য ও ইন্টারনেটের যুগ। এই যুগে বিতর্কে হুমকি, নিষেধাজ্ঞা, প্রতিরোধ, বিভ্রান্তি সৃষ্টি ইত্যাদি প্রয়োগ করে কোনো লাভ নেই। এখন একমাত্র সমাধান–মাঠে গিয়ে যুক্তি দিয়ে যুক্তির মোকাবিলা করা।

এখনকার আড্ডাগুলো জমে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনায়। তারা কী বিশ্বাস করে, কী করে না; কী জানে, কী জানে না–এই সব নিয়ে আলোচনা করে। চিন্তা-ভাবনা ও তর্কের বিষয়বস্তু যতই অগভীর হোক কিংবা তর্কের ধরন যতই শিশুতোষ হোক না কেন, তাদের অপমান করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই; বরং তাদের কথা শোনা এবং আন্তরিকতার সাথে কাছে টানা উচিত। কারণ, রোগ ও ওষুধের মধ্যে সামঞ্জস্যতা প্রয়োজন, যাতে শরীর চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে উপকার পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

অনলাইন আলোচনার ফোরাম থেকে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেগুলোর কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করলাম।

পক্ষে না থাকলেই আমার শত্রু : এই কথাটির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। অপরিচিত কারও সাথে কোনো আড্ডায় দেখা হলেই এই মানসিকতার লোকেরা প্রথমে আঁচ করে, অপর পক্ষের সাথে কোনো রকমের ইখতেলাফ ও মতপার্থক্য আছে কি না। যত দ্রুত সম্ভব আবিষ্কার করে–তাদের মধ্যে শাখাগত ছোটো কিংবা বড়ো মাসয়ালা বা যেকোনো মতপার্থক্যের বিষয় তো অবশ্যই আছে। তখন তাদের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতার অনুভূতির উপলব্ধি জন্ম নেয়। অথচ উচিত ছিল, পরস্পরকে প্রথমেই বন্ধু ভেবে নেওয়া। যেমন : ঈসা (আ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছিলেন–'আমার বিরুদ্ধে নয় এমন সকলই আমার নিজের মানুষ।' এটাই মূলত শরিয়াহর মেজাজ, এটাই জীবনবোধ এবং এটাই সামগ্রিক মানবতার উপলব্ধি।

প্রাথমিক পর্যায়েই কাউকে বিচার-বিশ্লেষণ করা বুদ্ধিমানের কাজ না। মানুষের জন্য খানা-খন্দক না খুঁড়ে সম্পর্কের সাঁকো তৈরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিষয়বস্তু ও ব্যক্তির মাঝে বিভ্রান্তি : মাঝেমধ্যে কোনো বিষয়বস্তু বা চিন্তা নিয়ে আলোচনা শুরু হলে আলোচনা অন্য দিকে মোড় নেয়। বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে ব্যক্তি-বিদ্বেষ ও ব্যক্তি-আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এরপর চলতে থাকে সম্মান নষ্ট করা, নিয়্যাতের ওপর দোষারোপ, অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। তারপর শুরু হয় বিভিন্ন বিষয়কে কেলেঙ্কারিতে রূপান্তর করা, অপবাদ দেওয়া। এমন বিষয় চাপিয়ে দেওয়া—যার সত্যতা সম্পর্কে আদালত কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি। একপর্যায়ে বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যায়। এগুলো খুবই জঘন্য অপরাধ, যা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি এবং পরস্পরকে অপরের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করে। কারণ, এই রকম কাজে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিকতা নেই, নেই কোনো যুক্তির কথা। আর কল্যাণ তো বহু দূরে। মূলত এটা কোনো আলোচনার ধরনই না।

দেখা গেছে, অধিকাংশ মানুষই এমন চিন্তাকে বেছে নেয়, যা তাদের মস্তিষ্কের কাছে ভালো লাগে, বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। আর এমন চিন্তাকে ছুড়ে ফেলে, যা তাদের মস্তিষ্ককে স্বস্তি দেয় না। এখানে বিশ্বাস, ভালোবাসা বা ঘৃণা জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নয়; বরং অন্যদের সুপারিশকৃত ও প্রদর্শিত একটি ছাঁচের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়ে থাকে!

নিম্নমানের ভাষার ব্যবহার : অনেক সময় আলোচনার ভাষা গালি ও অভিশাপে রূপ নেয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

> اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَالۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَجَادِلۡهُمۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ-
>
> ‘হে নবি! তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকো প্রজ্ঞাপূর্ণ সুবচনে। তাদের সাথে আলোচনা করো উত্তম যুক্তিতে। তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন, কে সৎপথ ছেড়ে বিপথে যাচ্ছে, আর কে সৎপথে রয়েছে।’ সূরা নাহল : ১২৫

আল গাজালি, ইবনে তাইমিয়া, শাতিবি (রহ.) প্রমুখ ইমামগণ মনে করেন— যদি চিৎকার-চ্যাঁচামেচির মাধ্যমেই বিতর্কে বিজয় লাভ করা যেত, তাহলে জাহেলরাই জ্ঞানীদের চেয়ে অধিক যোগ্য হতো। তাই প্রবাদে আছে—‘ভরা কলসির চেয়ে খালি কলসি বাজে বেশি।’[৪] গালিগালাজ ও অভিশাপ কখনোই বিতর্কের ভাষা হতে পারে না।

[৪] *ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দিন*, খণ্ড-১, পৃ.-৪৫; *দারউ তাআরুজিল আকলি ওয়ান নাকলি*, খণ্ড-৭, পৃ.-১২০; *আল মুয়াফিকাত*, খণ্ড-২, পৃ.-১৬৭

হৃদয়ের ঐক্য প্রয়োজন, মস্তিষ্কের ঐক্য নয়

হৃদয়ের ঐক্য মানে উম্মাহর সামগ্রিক হৃদয়ের একাত্মতা, ভ্রাতৃত্বের গভীরতা; হোক তা মত কিংবা চিন্তার ভিন্নতা! একটা প্রবাদ আছে—'মতের ভিন্নতা কখনো পারস্পরিক সৌহার্দ্য নষ্ট করতে পারে না।'

মতের ঐক্য কখনোই সম্ভব নয়। সবাইকে নির্দিষ্ট মতের ওপর নিয়ে আসা যদি সম্ভবই হতো, তাহলে আমাদের আলাদা আলদা মস্তিষ্ক না হয়ে একটি মস্তিষ্কই হতো। সুতরাং ইখতেলাফ মানেই হলো—জ্ঞানের পরাগায়ন, সৃজনশীলতা, বৈচিত্র্য ও ইজতিহাদ।

কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে উম্মাহর ঐক্য নিয়ে যেমন আদেশ রয়েছে, তেমনই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির ব্যাপারেও নিষেধ রয়েছে। উম্মাহর মধ্যে ঐক্য বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলিমরা খুবই সচেতন। এই ব্যাপারে কেউ ছাড় দেওয়ার নয়।

কিন্তু এই ঐক্য ও একতার ভিত্তি মূলত কী?

এর ভিত্তি হলো—দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় হুকুম-আহকাম ও সামগ্রিক কল্যাণের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য ও একাত্মতা। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ঈদ ইত্যাদি ঐক্যবদ্ধ আমলগুলোও সামগ্রিক ঐক্যের নমুনা।

আচার-আচরণের ব্যাপারটা ভিন্ন। কেননা, আচার-আচরণ শরিয়াহর অন্যতম মানদণ্ড, জীবনের নানান সাধারণ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জনমানুষের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আখলাক বা আচরণ তো কেবল অন্যের সাথে মেলামেশা, যোগাযোগ, লেনদেনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

সূরা আসরে আল্লাহ তায়ালা কসম খেয়ে বলেছেন—'সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে কেবল ক্ষতির বাইরে তারাই—যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের পরামর্শ দিয়েছে।' এই আয়াতে দাবি করা হচ্ছে—যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা ক্ষতির বাইরে। ঈমান আনা ও সৎকর্ম করা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, এটা কোনো ইজতিমায়ি বা ঐক্যবদ্ধ আমল নয়। কিন্তু একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের পরামর্শ দেওয়া ঐক্যবদ্ধ ও ইজতিমায়ি আমল।

সম্মিলিত ঐক্য-বিষয়ক কুরআনে যেমন আদেশ এসেছে, তেমন হাদিসেও এসেছে। 'রাসূল ﷺ বলেছেন—

'আল্লাহ তায়ালা তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যা পছন্দ করেন।' তা হলো—

১. তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে,

২. তাঁর সঙ্গে কিছুই শারিক করবে না এবং

৩. তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।

আর যে সকল বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন—

১. নিরর্থক কথাবার্তা বলা,

২. অধিক প্রশ্ন করা এবং

৩. সম্পদ বিনষ্ট করা।' মুসলিম : ১৭১৫

এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি—সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং নিজেদের মধ্যে ফিরকা সৃষ্টি না করা আল্লাহ তায়ালার খুবই পছন্দ।

পবিত্রতার সাথে হৃদয়ের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য এমন একটি বিষয়, যার ব্যাপারে কেউ কোনো দ্বিমত পোষণ করবে না। কিন্তু মস্তিষ্কের ঐক্য; এটা তো কখনোই সম্ভব না। মস্তিষ্ক বা মতের ঐক্যকে যদি সম্ভব হিসেবে মেনে নিই, তাহলে আমরা যেন ইসলামের ধ্বংস ও মুছে যাওয়ার ব্যাপারেই ঐকমত্যে পৌঁছলাম।

সুস্পষ্ট বাস্তবতা হলো—প্রত্যেক মুসলমানই নিজেদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা ধারণ করে। কিন্তু ঐক্যের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার উদ্যম তেমন লক্ষ করা যায় না। দ্বীন ও উম্মাহর ঐক্যের প্রতি যাদের প্রচণ্ড আগ্রহ আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই ঐক্য বাস্তবায়নের পথ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। তারা সকল মুসলিমের ঐক্যের ব্যাপারে খুব ব্যথিত হয়, কাঁদে। কিন্তু অন্য দিকে তারা ঐক্য মানে এমনটাই দাবি করে—পৃথিবীর সকল মুসলিম কেবল একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস, মতামত, পছন্দ ও ব্যাখ্যায় ঐকমত্যে আসবে, যা কখনোই সম্ভব না।

এই ধরনের চিন্তকরা এটা মনে রাখে না—তাদের চেয়েও উন্নত চিন্তা ও দর্শন মুসলিম জাতির কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল; কিন্তু সকল মুসলিম কখনোই নির্দিষ্ট চিন্তা ও পথের ওপর ঐকমত্য হয়নি। কারণ, নির্দিষ্ট একটি মতের ওপর সবার একমত হওয়াটা অসম্ভব; বরং বিষয়টি হলো—এখানে এমন একটি পদ্ধতি মেনে চলতে হবে, যা মতভেদকে যেমন স্বীকার করে নেবে, তেমনই উপযুক্ত শরিয়াহর সঠিক ও সহিহ মূলনীতির ওপরেই স্থির থাকবে; কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত মতামতের ভিত্তিতে নয়।

শ্রেণিগত ঐক্যের অর্থ—একটি একক মুসলিম জাতি, যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার শরিয়াহ দ্বারা একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের একক কর্তৃত্বের অধীনে থাকবে। নবি ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে এমনটাই ছিল। উম্মাহর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ এক ভয়ংকর ব্যাপার। এজন্যই এই বিষয়ে কঠোর রায় ও সতর্কতা এসেছে। যেমন : রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘কেউ যখন সামগ্রিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তখন তার মৃত্যু হয় জাহেলি যুগের মৃত্যু।’ বুখারি : ৭০৫৪, মুসলিম : ১৮৪৯

আরেক হাদিসে আছে—

> ‘যে ব্যক্তি (আমিরের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে, তার কোনো প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোনো চুক্তি নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু।’ মুসলিম : ১৮৫১

এই হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অযৌক্তিক মতভেদ কতটা ভয়ানক ও বিপজ্জনক। এই হাদিসগুলো থেকে ঐক্যের ব্যাপারে খুব জোর দেওয়া হয়েছে।

মুসলিমদের ঐক্যের সব গল্পই অতীতের। তাদের ঐক্য ছিল, একসময় একে একে সব ভেঙে গেল। এক উম্মাহ ভেঙে কত কত দেশ হলো। দেশে দেশে কত শত দল-মতের সৃষ্টি হলো, সংঘাত হলো। মূলত এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো–শরিয়াহর মূলকে আঁকড়ে ধরা এবং শরিয়াহ যেই উদ্দেশ্যে যে বিষয়টির অবতারণা করেছে, সেই উদ্দেশ্যকেই আমাদের বাস্তবায়ন ও হেফাজত করা। এটাই আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজে দেবে। কারণ, ইসলামের শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য শুধু দ্বীন বা দুনিয়াকে সংরক্ষণ করা নয়; বরং দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে সংরক্ষণ করা। শরিয়াহ বাস্তবায়নপন্থি স্কলাররা এমনই মতামত দিয়ে থাকেন।

স্থান, কাল ও পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে শরিয়াহর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়ন করা যায় না। ফলে মানুষের উচিত, তার পক্ষে শরিয়াহর উদ্দেশ্য যেটুকু সম্ভব, সেটুকু বাস্তবায়ন করা।

শরিয়াহর উদ্দেশ্য প্রচার করাও আবশ্যক। এই শরিয়াহ আসমানি পয়গাম। তাই এর দাওয়াত দিতে হবে মন-প্রাণ খুলে, যেন বাস্তবেই এই শরিয়াহ সবার রক্ষক হয়ে ওঠে। শরিয়াহর নিয়মকানুন কোনো প্রাণের বিনাশের জন্য নয়, কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্যও নয়; বরং শরিয়াহ হলো ফিতনা বন্ধ হওয়ার অস্ত্র। শরিয়াহকে তার সঠিক শর্ত অনুযায়ী সঠিক স্থানে ব্যবহার করতে হবে।

তেমনিভাবে রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মসূচি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে নেতৃত্বের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এটা বিশ্বে মুসলমানদের একটি আন্তর্জাতিক উপস্থিতি জানান দেবে এবং মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করবে। তখন মুসলিম উম্মাহ যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে একধরনের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে।

সামগ্রিক ঐক্যের পেছনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

সামগ্রিক ঐক্যের পেছনে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যুগ ও সময়ভেদে প্রতিবন্ধকতাও ভিন্ন রকম হয়। এখানে মৌলিক তিনটি প্রতিবন্ধকতা আলোচনা করব—

প্রথমত, শরিয়াহর টেক্সটগুলোকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ঐক্য আর সম্ভব হয় না। কিছু দল আছে, যারা সামগ্রিক ঐক্যের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত হাদিসগুলো নিজেদের দলের সাথে খাস বা নির্দিষ্ট করে নেয়। হাদিসগুলোকে নির্দিষ্ট দল, সংগঠন বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে জোর প্রচারণা চালায়। তখন এই রকমের প্রত্যেক গোষ্ঠী ও দল এবং দলের সদস্যরা এই হাদিসগুলোকে নিজেদের বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। তারপর অন্যদের এই হাদিসগুলো থেকে খারিজ করে দেয়। এতে দলের সদস্যদের অন্ধভক্তি, এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার, জান-প্রাণ দিয়ে মান্য ও অনুসরণ করতে বাধ্য করে।

এই দলের বাইরে যারাই আছে, তাদের বাতিল মনে করতে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর হাদিস ব্যবহার করে বলে—

> ‘কেউ যখন সামগ্রিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তখন তার মৃত্যু হয় জাহেলি যুগের মৃত্যু।’ বুখারি : ৭০৫৪, মুসলিম : ১৮৪৯

এবং আরও দলিল দেয়—

> ‘যে ব্যক্তি (আমিরের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে, যে তার কোনো দলিল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোনো চুক্তি নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু।’ মুসলিম : ১৮৫১

এইভাবে তারা নিজেদের দলকে বাকি মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। আর নিজেদের দল নিয়েই খুশি থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন—

كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ-

‘প্রত্যেক দলই নিজেদের কাছে যা রয়েছে, তা নিয়ে খুশি।’ সূরা মুমিনুন : ৫৩

দ্বিতীয়ত, কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আছে, যারা টিকেই থাকে অন্যান্য ইসলামিক প্রচেষ্টাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতিপন্ন করার মধ্য দিয়ে। এই জাতীয় দল বা ব্যক্তি অন্যদের সাথে ছোটোখাটো মাসয়ালা, মাসয়ালার অংশ, ইজতিহাদ ইত্যাদি নিয়ে মতবিরোধ এবং এক স্থানের টেক্সট অন্য স্থানে ব্যবহার করে অন্যদের অযৌক্তিকভাবে হেয় করে।